মুসলমানের রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতা

মুসলমানের রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতা

আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু

অনলাইনে অর্ডার করতে
http://nalonda.com.bd

কলকাতায় পরিবেশক
বইবাংলা
স্টল ১৭, ব্লক ২, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলেজ স্কোয়ার দক্ষিণ, কলকাতা ৭০০০১২
ফোন : +৯১৭৯০৮০৭১৭৬৫ (কলকাতা)

মুসলমানের রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতা	আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
প্রকাশক	রেদওয়ানুর রহমান জুয়েল নালন্দা ৩৮/৪ বাংলাবাজার (মান্নান মার্কেট) ৩য় তলা ঢাকা-১১০০
প্রচ্ছদ	.সজল চৌধুরী
প্রথম প্রকাশ	ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মুদ্রণ	শামীম প্রিন্টিং প্রেস
বর্ণবিন্যাস	নালন্দা কম্পিউটার বিভাগ
মূল্য	৭৫০.০০ টাকা মাত্র
যুক্তরাষ্ট্র পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইটস নিউইয়র্ক

© Writer

Musalmaner Rokte Lekha Bharoter Shadhinota	
(A Historical Book By)	Anwar Hossain Manju
Publisher	Redwanur Rahman Jewel Nalonda 38/4 Banglabazar (Mannan Market) 2nd Floor Dhaka-1100
Cover Design	Sazal Chowdhury
First Published	February 2024
Printers	Shameem Printing Press
Compose & Make-up	Nalonda Computer Department
Price	750.00 Taka Only
ISBN	978-984-98390-4-0
E-mail	nalonda71@gmail.com

উৎসর্গ

সূচিপত্র

লেখকের কথা

ভূমিকা : যেন শেকড় ভুলে না যাই

১. মুসলমানের রক্তে লেখা ভারতের স্বাধীনতা : খুশবন্ত সিং
২. ভারতে হিন্দু-মুসলিম প্রশ্নে রাজমোহন গান্ধীর উদ্‌বেগ
৩. বখত খান : হেরে যাওয়া যুদ্ধের বিজয়ী বীর
৪. মোগল বংশের শেষ উত্তরাধিকারী মির্জা মোগলের হত্যাকাণ্ড
৫. ব্রিটিশের কাছে হার না মানা মোগল শাহজাদা ফিরোজ শাহ
৬. নারীর অহংকার অযোধ্যার বিদ্রোহী বেগম হজরত মহল
৭. মুহাম্মদ বকর : উপমহাদেশের প্রথম শহিদ সাংবাদিক
৮. এলাহাবাদের বীর সেনানী মৌলবি লিয়াকত আলী
৯. ব্রিটিশের ফাঁসিতে প্রবীণ রোহিলা প্রধান খান বাহাদুর খান
১০. পীর আলী খান : এক স্বাধীনতা সংগ্রামীর অশ্রুত কাহিনি
১১. ফৈজাবাদের বিপ্লবী নেতা : মৌলবি আহমদুল্লাহ শাহ
১২. ব্যর্থতা সত্ত্বেও স্বাধীনতার অনন্য প্রতীক আজিমুল্লাহ খান
১৩. 'শের-এ-হায়দরাবাদ' তুরাবাজ খান
১৪. কানপুরের যুদ্ধে আজিজুন বাই এর ভূমিকা
১৫. হায়দরাবাদ রেসিডেন্সিতে হামলার নেতা মৌলবি আলাউদ্দিন
১৬. চট্টগ্রামকে ত্রিশ ঘণ্টা ব্রিটিশ মুক্ত রাখেন হাবিলদার রজব আলী
১৭. সম্মানিত যোদ্ধা সুলতানপুরের মেহেদী হাসান
১৮. ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অনন্য সামরিক প্রতিভা আমির খান পিন্ডারি
১৯. ভাইসরয় লর্ড মেয়ো'কে হত্যা করে ফাঁসিতে ঝোলেন শের আলী আফ্রিদি
২০. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ : প্রকাশ্যে হত্যা করেন প্রধান বিচারপতি নরম্যানকে
২১. মৃত্যুদণ্ডের রায়ে হাসছিলেন জাফর থানেশ্বরী
২২. আন্দামানের বন্দি ফজলে হক খয়রাবাদী
২৩. ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক যুদ্ধের নায়ক মাহমুদ হাসান

২৪. বরকতউল্লাহ ভোপালি : আজীবন স্বাধীনতা সংগ্রামী
২৫. তেজোদ্দীপ্ত নেতা মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি
২৬. মোহাম্মদ ইকবাল শেদাই : বিপ্লবী সেনানায়ক
২৭. শান্তিকামী স্বাধীনতা সংগ্রামী সাইফুদ্দীন কিসলু
২৮. ব্রিটিশ বিরোধী অদম্য নারী সংগ্রামী 'বি আম্মা'
২৯. ফাঁসির মঞ্চে তরুণ স্বাধীনতা সংগ্রামী আশফাকউল্লাহ খান
৩০. কিংবদন্তিতুল্য নেতা হাকিম আজমল খান
৩১. দেশভাগের বিরুদ্ধে অটল ছিলেন মাওলানা আজাদ
৩২. 'ইনকিলাব' ধ্বনির জনক মাওলানা হাসরত মোহানি
৩৩. স্বাধীনতা সংগ্রামী ও গণতন্ত্রের কারিগর মাগফুর আইজাজি
৩৪. খ্যাতিমান স্বাধীনতা সংগ্রামী আল্লাহ বখশ সুমরো
৩৫. আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রাণপুরুষ : মেজর জেনারেল শাহনওয়াজ খান
৩৬. 'জয়হিন্দ' স্লোগানের স্রষ্টা আবিদ হাসান সাফরানি
৩৭. 'ত্রিরঙ্গা'র চূড়ান্ত নকশা করেন সুরাইয়া তাইয়েবজি
৩৮. কেরালার আলী মুসলিয়ার : ইমাম থেকে স্বাধীনতা যোদ্ধা
৩৯. ধর্মভিত্তিক জাতিতত্ত্বের ঘোর বিরোধী হুসাইন মাদানি
৪০. গান্ধীর ডাকে পড়াশোনা ছাড়েন কেরালার আবদুর রহিমান

লেখকের কথা

স্কটিশ ইতিহাসবিদ এবং ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের সদস্য স্যার উইলিয়াম হান্টার তার বিখ্যাত গ্রন্থ "দ্য ইন্ডিয়ান মুসলমানস" এ উল্লেখ করেছেন, "ভারতের মুসলমানরা বহু বছর ধরে ভারতে ব্রিটিশ শক্তির দীর্ঘস্থায়ী বিপদের কারণ হিসেবে ছিল।" ১৭৫৭ সালে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনার পর থেকে ব্রিটিশ শক্তিকে মুসলমানদের পক্ষ থেকে সবচেয়ে বড়ো প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর একশ বছর পর ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ খ্যাত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামেও মুসলমানদের ভূমিকাই ছিল প্রধান। সিপাহি বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে তাদের শাসন নির্বিঘ্ন করা বা তাদের পথের কাঁটা দূর করতে যে কঠোর শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল, তখনও ব্রিটিশের নির্মমতার শিকারে পরিণত হয়েছিলেন মুসলিম নেতৃবৃন্দ। তারা মুসলিম নেতৃবৃন্দকে বিনা বিচারে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছে, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের সাজা দিয়েছে।

১৯৪৭ সালের পর অধিকাংশ ভারতীয় ইতিহাসবিদ ও গবেষক ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে তথাকথিত "জাতীয়তাবাদী" ইতিহাস রচনা করেছেন, সে ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে অজ্ঞাত কারণে তারা মুসলমানদের অবদানকে মুছে দিয়েছেন। বিগত সাড়ে সাত দশক যাবৎ আমরা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ইতিহাস পাঠ করছি, সেখানে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে অনুপস্থিত, অথবা যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের অবদানকে প্রায় ক্ষেত্রে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সাড়ে সাত দশকে যারা ভারতের স্বাধীনতার ইতিহাস পাঠ করেছেন এবং এখন যে প্রজন্ম বেড়ে উঠছে, তারা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস থেকে যা জানতে পারছে, তাতে তারা হয় বিশ্বাস করছে যে, মুসলমানরা ব্রিটিশপন্থি ছিল, অথবা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তারা আদৌ অংশগ্রহণ করেনি।

সোশ্যাল মিডিয়ার এই যুগে ভারতে, এমনকি বহুসংখ্যক ভারতের স্যাটেলাইট টেলিভিশন টকশোতে অনেক উগ্রপন্থি আলোচক উপমহাদেশে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা মুসলমানদের ভূমিকা ও দেশপ্রেম নিয়ে প্রশ্ন তুলছে তাদের ভ্রান্ত উপলব্ধি ও মূল্যায়নের কারণে। ২০১৯ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দ্বারা উন্মোচন করা "ডিকশনারি অভ ইন্ডিয়া'স ফ্রিডম স্ট্রাগল ১৮৫৭-১৯৪৭" অনুযায়ী স্বাধীনতা সংগ্রামে শাহাদত বরণকারীদের ৩০ শতাংশ ছিল মুসলমান। এ ডিকশনারিতে ১৮৫৭ সালের পূর্বে শহিদদের সম্পর্কে কোনো উল্লেখ নেই। কিন্তু ১৭৫৭ সালে পলাশিতে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলার পতন থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজশক্তি ভারতে

তাদের শাসন সম্প্রসারণ করেছে মুখ্যত মুসলিম শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই করে।

ইতিহাসের নামে ভারতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যে বিভ্রান্তিকরণ প্রচারণা চালানো হচ্ছে এবং মুসলমানদের অবদানকে খাটো করে দেখানো হচ্ছে বা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হচ্ছে তা চ্যালেঞ্জ করা প্রয়োজন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূচনালগ্ন থেকে তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছিল মুসলমানরাই। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বাংলার প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব গ্রহণ করেছে পলাশি ও বক্সারের যুদ্ধে যথাক্রমে নওয়াব সিরাজউদ্দৌলা ও মীর কাসিমকে পরাজিত করার পর। ওই সময় থেকে তারা যে বেপরোয়া লুণ্ঠন চালাতে শুরু করে তার পরিণতি ছিল ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ, যে দুর্ভিক্ষে বাংলার মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ দেহত্যাগ করেছিল।

বিস্ময়ের কিছু নেই যে, বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম জাতীয় প্রতিরোধও শুরু হয়েছিল বাংলা থেকেই। হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলিম ফকিররা ঐক্যবদ্ধভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়, যার নেতৃত্বে ছিলেন উত্তর প্রদেশের কানপুরের এক মুসলিম সুফি মজনু শাহ। তিনি ছিলেন কানপুরের শাহ মাদার নামে এক সুফির মুরিদ। মজনু শাহ আরেকজন সুফি হামিদুদ্দীনের পরামর্শে দরিদ্র কৃষকের স্বার্থে এই আন্দোলনে অবতীর্ণ হন। তার অধীনস্থ প্রায় ২,০০০ সন্ন্যাসী ও ফকির ব্রিটিশ ও ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভকারী জমিদারদের কোষাগার ও গোলা দখল করে প্রাপ্ত অর্থ ও খাদ্য দরিদ্র ও শোষিত জনগণের মাঝে বিলিয়ে দেয়। মজনু শাহ ১৭৬৩ থেকে ১৭৮৬ সালে তার মৃত্যু পর্যন্ত ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বিপজ্জনক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। সন্ন্যাসী ও ফকিরগণ তাদের চোরাগুপ্তা যুদ্ধ কৌশলে বেশ কিছু সংখ্যক ব্রিটিশ অফিসার ও সৈন্যকে হত্যা করে। তার মৃত্যুর পর মুসা শাহ এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ভবানী পাঠকের মতো হিন্দু সন্ন্যাসী নেতারা তাদের অনুসারীদের নিয়ে মুসলমানদের পাশাপাশি লড়াই করেছে। ব্রিটিশ রেকর্ডে মজনু শাহকে চরম হুমকিপূর্ণ বিবেচনা করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, কারণ তার অধীনে হিন্দু ও মুসলমানরা যৌথভাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়েছে। মজনু শাহের মৃত্যুর কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কঠোর হাতে এই আন্দোলন দমন করতে সক্ষম হলেও জাতীয়তাবাদের চেতনাকে তারা হত্যা করতে পারেনি। বাংফকির ও সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ দমন করা হলেও তারা পরাজয় মেনে নেয়নি। ফকিররা তাদের কৌশল পরিবর্তন করে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে তারা মারাঠা এবং অন্যান্য ব্রিটিশ বিরোধী শক্তির সঙ্গে যোগ দেয়।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীতে দেশীয় সিপাহিদের প্রথম বড়ো ধরনের বিদ্রোহ ঘটে ১৮০৬ সালে তামিলনাড়ুর ভেলোরে, যে বিদ্রোহকে ১৮৫৭ সালে দেশীয় সিপাহিদের মহাবিদ্রোহের অনুপ্রেরণা বিবেচনা করা হয়। এ বিদ্রোহের পরিকল্পনার পেছনে ছিলেন মারাঠা হোলকার নেতৃবৃন্দ, টিপু সুলতানের দুই পুত্র এবং হায়দরাবাদের নিজামের ভাই। ফকিররাও এ বিদ্রোহে সহায়ক শক্তি ছিল। দক্ষিণ ভারতের প্রতিটি সেনানিবাসে ফকিররা তাদের ধর্মীয় বক্তৃতা, গান ও পুতুলনাচের মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের বার্তা প্রচার করে। যখন বিদ্রোহ শুরু হয়, তখন ভেলোরের মতো কিছু স্থানে ভারতীয় বিপ্লবীদের নেতৃত্ব দিয়েছেন শেখ আদম, পীরজাদা, আবদুল্লাহ খান, নবি শাহ ও রুস্তম আলীর মতো ফকির নেতৃবৃন্দ। কেরালার গবেষক পেরুমল চিননিয়ান লিখেছেন, "দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহে সমর্থন ছিল ফকির এবং অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর। তাদের দ্বারা এ বিদ্রোহ সকল সেনা ঘাঁটিতে সংঘটিত হয়েছিল।"

কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আরেকটি চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়েছিল তিনটি সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের আকারে, যার নেতৃত্বে ছিলেন সৈয়দ আহমদ বেরেলভি, হাজি শরিয়তুল্লাহ ও তীতুমীর। উত্তর প্রদেশের বেরেলিতে জন্মগ্রহণকারী সৈয়দ আহমদ দেশের বিরাট অংশ সফর করেন এবং বিহারম বাংলা ও মহারাষ্ট্র থেকে তার অনুসারী সংগ্রহ করেন। তারা আফগানিস্তান সংলগ্ন এলাকায় ব্রিটিশ ও তাদের মিত্রদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেয়। কয়েক দশক পর্যন্ত এ আন্দোলন ব্রিটিশের জন্য বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ রেকর্ডে এ আন্দোলনকে ধর্মীয় উগ্রবাদ দ্বারা প্রভাবিত বলা হলেও বাস্তবে সৈয়দ আহমদ বিদেশি শাসকের বিরুদ্ধে লড়ার উদ্দেশ্যে মারাঠাদের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৩১ সালে তিনি বালাকোটের যুদ্ধে শহিদ হওয়ার পর পাটনার এনায়েত আলী ও বেলায়ে আলী এ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাদের বাহিনীর সঙ্গে সীমান্ত অঞ্চলে ব্রিটিশ বাহিনীর বেশ কিছু সংঘর্ষে কয়েকশ ব্রিটিশ সৈন্যের প্রাণহানি ঘটে।

হাজি শরিয়তুল্লাহ এবং তার পুত্র দুদু মিয়া বাংলায় অস্ত্র হাতে নেন ব্রিটিশের সমর্থনপুষ্ট জমিদারদের শোষণ ও স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে। তারা ব্রিটিশ নীল ব্যবসায়ী ও অন্যান্য ব্রিটিশ এজেন্টদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন। ইতিহাসে এ আন্দোলন ফরায়েজি আন্দোলন হিসেবে খ্যাত। তীতুমীর ব্রিটিশ সমর্থিত জমিদারদের বিরুদ্ধে বাংলার দরিদ্র কৃষকের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। তিনি তার বাহিনী গড়ে তোলেন এবং তার প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৩১ সালে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই

চলাকালে তিনি নিহত হন। তার প্রধান সহকারী গোলাম রসুলসহ শত শত অনুসারীকে গ্রেফতার করে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

সেয়দ আহমদ বেরেলভি যে সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, তা ব্রিটিশ শাসনের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে এনেছিল, যা তার মৃত্যুর পর অব্যাহত রেখেছিলেন তার অনুসারী এনায়েত আলী, বেলায়েত আলীম, কারামত আলী জইনউদ্দীন, ফরহাত হুসাইনসহ আরও অনেকে। তারা ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে একটির পর আরেকটি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে বিদেশি শাসক গোষ্ঠীকে দিশেহারা অবস্থার মধ্যে ফেলেছিলেন। ১৮৫৭ সালে মিরাট ও দিল্লিতে দেশীয় সিপাহিদের বিদ্রোহের খবর বিহারের পাটনায় পৌঁছার পর সেখানকার নেতৃবৃন্দ বিদ্রোহে ভূমিকা পালন করতে পারেন আঁচ করে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হয়। তা সত্ত্বেও পাটনার এক পুস্তক বিক্রেতা পীর আলী খান বিদ্রোহ করেন। এটি যদিও সিপাহি বিদ্রোহের অংশ ছিল না, কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা ছিল যে, বিদ্রোহের সঙ্গে পীর আলীর সম্পর্ক রয়েছে। ১৮৫৭ সালের ৩ জুলাই তিনি তার অনুসারীদের নিয়ে সফল বিদ্রোহ করেন। কিন্তু পরদিন তাকে ও তার সঙ্গী এবং সমর্থকদের গ্রেফতার করে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়।

১৮৫৭ সালে সংঘটিত ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরিকল্পনার পেছনে দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৮৩৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকার হায়দরাবাদের নিজামের ভাই মুবারিজ-উদ-দৌলা নামে এক মুসলিম নেতাকে গ্রেফতার করে তিনি বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছেন সন্দেহে। তিনি ব্রিটিশ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন, তার সঙ্গে পাঞ্জাবের মহারাজা রণজিৎ সিংসহ উত্তর ও মধ্য ভারতের বহু রাজা ও নওয়াব সম্মত ছিলেন। তিনি তাদের মিলিত শক্তির পক্ষে সমর্থন ও সহায়তা পাওয়ার জন্য পারস্য ও ফরাসি সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন বলে ব্রিটিশ তদন্তে প্রকাশ পায়। কয়েকজন বিশ্বাসঘাতকের কারণে এ পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে যায়। মুবারিজ-উদ-দৌলা ১৮৫৪ সালে কারাগারে দেহত্যাগ করেন।

১৮৪৫ সালে সমগ্র ভারতব্যাপী স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরুর পরিকল্পনা ব্রিটিশের জানাজানি হয়ে যায়। শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফর, সিন্ধিয়া ও নেপাল নরেশেসহ বেশ কয়েকজন রাজন্যর সহায়তায় খাজা হাসান আলী খান, মালিক খাদেম আলী, সাইফ আলী ও কুনওয়ার সিং একটি বিরাট সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। আবারও কয়েক কয়েক ভারতীয়, যারা বিদেশি শাসকের কাছে নিজেদের বিক্রি করে

দিয়েছিল, তাদের চক্রান্তে ব্রিটিশ শক্তিকে ভারত থেকে উৎখাতের বড়ো ধরনের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহ, যা যথার্থই ভারতের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ ছিল, এই যুদ্ধে মুসলমানদের ভূমিকা ধামাচাপা দেওয়ার উপায় নেই। এই যুদ্ধে হিন্দু ও মুসলমানদের মাঝে যে ঐক্য গড়ে উঠেছিল, সে ঐক্য ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তিকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং এর আগে ব্রিটিশরা আর কখনো এত বড়ো হুমকির মোকাবিলা করেনি। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ শক্তি তাদের শাসনকে পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে স্থায়ীভাবে হিংসা-বিদ্বেষমূলক মনোভাব টিকিয়ে রাখতে 'ডিভাইড অ্যান্ড রুল' বা বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন করার নীতি গ্রহণ করে। ফৈজাবাদের আহমদউল্লাহ শাহ. ফজলে হক খয়রাবাদী, মুজাফফরনগরের ইমদাদউল্লাহ মুহাজির মক্কী, নানা সাহিবের সহযোগী আজিমুল্লাহ খানের মতো নেতৃবৃন্দ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নেওয়ার আবশ্যকতার ওপর জোর প্রচারণা চালান। ১৮৫৭ সালের অনেক আগে থেকেই তারা ব্রিটিশ বাহিনীর দেশীয় সিপাহি এবং বেসামরিক নাগরিকদের মধ্যে তারা এই প্রচারণা চালিয়ে আসছিলেন।

১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটে দেশীয় সিপাহিরা তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তাদের নেতা ছিলেন শেখ পীর আলী, আমির কুদরত আলী, শেখ হাসান-উদ-দীন ও শেখ নূর মুহাম্মদ। প্রাথমিকভাবে বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী ৮৫ জন দেশীয় সিপাহি, যারা নতুন চালু করা এনফিল্ড রাইফেলে গরু ও শূকরের চর্বি মিশ্রিত কথিত কার্তুজ ব্যবহার করতে অস্বীকার করায় শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, তাদের অর্ধেকের বেশি ছিল মুসলিম। শিগগিরই সিপাহিদের সঙ্গে বেসামরিক লোকজন যোগ দেয় এবং বিদ্রোহী সিপাহিরা দিল্লি গিয়ে শেষ মোগল সম্রাট বয়োবৃদ্ধ বাহাদুর শাহ জাফরকে ভারতের সম্রাট ঘোষণা করে। তারা দিল্লিকে ব্রিটিশ মুক্ত করে। লখনৌ এ বেগম হজরত মহল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং বিদ্রোহ চলাকালে দীর্ঘতম সময় ধরে প্রতিরোধ চালিয়ে যান। মৌলবি আহমদউল্লাহ তার বাহিনী নিয়ে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে শাহাদত বরণ করেন। তার বীরত্ব ও সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন ব্রিটিশ ইতিহাসবিদগণ, এমনকি ভারতে উগ্র হিন্দু সংগঠন 'আরএসএস' এর প্রতিষ্ঠাতা বীর সাভারকর পর্যন্ত তার গ্রন্থে আমদউল্লাহ শাহের সাহস ও শাহাদতের ওপর বেশ কয়েক পৃষ্ঠা উৎসর্গ করেছেন।

ওই সময়ের জনপ্রিয় মুসলিম নেতা কাসিম নানাতুবি রশীদ গাঙ্গোহি'র সহায়তায় ইমাদউল্লাহ উত্তর প্রদেশের মুজাফফরনগরে জনপ্রিয় বিদ্রোহ

ঘটিয়ে থানা ভাওয়ানের শামলি মুক্ত করেন। সেখানে একটি জাতীয় সরকার গঠন করা হয়। এক পর্যায়ে ব্রিটিশ বাহিনীর হাতে তারা পরাজিত হন। দেশ মাতৃকার জন্য যুদ্ধ করার কারণে ঝাজ্জারের নওয়াব আবদুর রহমানকে ফাঁসিকে ঝোলানো হয়। সিপাহি বিদ্রোহে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী নেতৃস্থানীয় মুসলিম শহীদের তালিকা বিস্তৃত। এমনকি অনেক মুসলিম নারীও বিদ্রোহে অংশ নেয়। বিহারে বিদ্রোহে নেতৃত্ব দান করেন কুনওয়ার সিং, যার বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সহকারীরা ছিলেন মুসলিম, যাদের সঙ্গে তিনি প্রতিটি পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করতেন। আরাহ এলাকাকে ব্রিটিশ মুক্ত করার পর তিনি সেখানে যে বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করেন, সে সরকারে অনেক মুসলিম নেতা অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যাদের মধ্যে শেখ গোলাম ইয়াহিয়া ছিলেন বিচারক, শেখ মুহাম্মদ আজিমউদ্দিন ছিলেন খাজাঞ্চি, দিওয়ান শেখ আফজালের দুই পুত্র তোরাব আলী ও খাদিম আলীকে নিয়োগ করা হয়েছিল শহর কোতোয়াল বা দারোগা।

ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতবাসীর প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল হয়নি। ব্রিটিশ সরকার দিল্লি এবং অন্যান্য স্থানে বিদ্রোহ দমনের পর শেষ মোগল সম্রাটকে বিদ্রোহের প্রধান নেতৃত্ব দানকারী সাব্যস্ত করে এবং তড়িঘড়ি বিচার করে বর্তমান মায়ানমারের ইয়াঙ্গনে নির্বাসিত করে। মোগল রাজবংশের প্রায় সকল জীবিত পুরুষ সদস্যদের গুলি করে অথবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করা হয়। নেতৃস্থানীয় মুসলমানদের কামানের গোলায় উড়িয়ে দেওয়া হয় এবং বহু সংখ্যককে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে নির্বাসনে পাঠানো হয়। তা সত্ত্বেও ভারতীয় মুসলমানদের হৃদয় থেকে স্বাধীনতার চেতনা মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি।

১৮৬৩ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের উপজাতিরা ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলে হামলা চালিয়ে ব্রিটিশ শাসনের প্রাথমিক বিজয় লাভ করে এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্রিটিশের ওপর সামরিক চাপ বজায় রাখে। এসময় উপজাতি মুসলিমদের হাতে এক হাজারের অধিক ব্রিটিশ সৈন্য নিহত হয়েছিল। উপজাতি বিদ্রোহের পেছনে তারা আম্বালার জাফর থানেশ্বরীর ভূমিকা আবিষ্কার করে এবং তাকে গ্রেফতার করে আন্দামানে প্রেরণ করে। পাটনার ইয়াহিয়া আলী এবং আরও নয় জনকে ইংল্যান্ডের রাণির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য অভিযুক্ত করা হয়। এভাবে সমগ্র ভারতজুড়ে গ্রেফতার ও বিচারের প্রহসনের মাধ্যমে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠানো হয়। ১৮৬৯ সালে আমির খান ও হাশমত খানকে কলকাতায় গ্রেফতার করার পর ১৮৭১ সালে কলকাতা হাইকোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি জন প্যাক্সটন নরম্যান তাদেরকে যাবজ্জীবন আন্দামানে নির্বাসিত জীবন কাটানোর জন্য প্রেরণের রায় প্রদান করলে মুসলমানরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে

এবং মোহাম্মদ আবদুল্লাহ নামে এক পাঞ্জাবি মুসলিম প্রকাশ্য দিবালোকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন। এর কয়েক মাস পর আন্দামানে নির্বাসিত এক তরুণ পাঠান মুসলিম বন্দি ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড মেয়োকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করেন।

বিপ্লবী বিপিন চন্দ্র পাল তার আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন যে, এসব বিচার ও হত্যাকাণ্ড তার রাজনৈতিক জীবনকে দারুণভাবে প্রভাবিত করেছিল। অপর এক খ্যাতিমান বিপ্লবী ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, যিনি ১৯১৪ থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত আন্দামানের সেলুলার দ্বীপে বন্দি জীবন কাটিয়েছেন, তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের কাহিনি "জেলে ত্রিশ বছর : ব্রিটিশ-পাক-ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "মুসলিম বিপ্লবী ভাইয়েরা আমাদের অবিচল সাহস ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির ব্যবহারিক শিক্ষা দিয়েছেন এবং তাদের ভুল থেকে শিক্ষা গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।"

মহারাষ্ট্রে রোহিলা নেতা ইব্রাহিম খান ও বলওয়ান্ত ফাদকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন, যা ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড হুমকি হিসেবে ছিল। এদিকে বিকাশমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির চেতনা ও তাদের তথা ভারতের সমস্যা ব্যক্ত করার উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ সালে গঠিত ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস গঠিত হয়েছিল। কংগ্রেসের প্রথম দিকের দুজন মুসলিম সদস্য ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন বদরুদ্দীন তাইয়েবজি (১৮৮৭), রহমতুল্লাহ এম সায়ানি (১৮৯৬)। পরবর্তীতে আরও অনেক মুসলিম নেতা কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তারা ছিলেন : নওয়াব সাইয়িদ মুহাম্মদ বাহাদুর (১৯১৩), সাইয়িদ হাসান ইমাম (১৯১৮), হাকিম আজমল খান (১৯২১), মোহাম্মদ আলী জওহর (১৯২৩), এম এ আনসারি, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ (১৯২৩ এবং ১৯৪০-৪৬), মুখতার আহমেদ আনসারি (১৯২৭)। এছাড়া ভারতের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের বিভিন্ন পর্যায়ে আরও অনেক মুসলিম জড়িত থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ গুপ্তচরেরা রেশমি কাপড়ের ওপর হাতে লেখা তিনটি চিঠি আটক করে। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি চিঠিগুলো লিখেছিলেন মাওলানা মাহমুদ হাসানকে, যে চিঠিগুলোতে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর লক্ষ্যে বৈশ্বিক পরিকল্পনার ইঙ্গিত ছিল। পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশের রাওলাট কমিটি রিপোর্টে মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধিকে ব্রিটিশের জন্য অন্যতম বিপজ্জনক ভারতীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি সশস্ত্র গ্রুপ গঠন করেছিলেন, জনগণের মাঝে ব্রিটিশ বিরোধিতার

প্রচারণা চালিয়েছেন, এমনকি তিনি কাবুলে ভারতীয়দের একটি প্রবাসী সরকার পর্যন্ত গঠন করেছিলেন। এই প্রবাসী সরকারের প্রধানমন্ত্রী করা হয়েছিল মাওলানা বরকতউল্লাহকে। প্রবাসী সরকার একটি সেনাবাহিনীও গঠন করেছিল, যে বাহিনী ভারতকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে আফগানিস্তান থেকে ভারতের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করার পরিকল্পনা করে। কিন্তু রেশমি চিঠির রহস্য ফাঁস হয়ে যাওয়া এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ায় এ পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এ পরিকল্পনা 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' এবং ৫৯ জন স্বাধীনতা সংগ্রামীকে অভিযুক্ত করা হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য। অভিযুক্তদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ, আবদুল বারী ফিরাঙ্গি মাহলি, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ সিন্ধি, মাওলানা মাহমুদ এবং মাওলানা মাদানিসহ অভিযুক্তদের অনেককে মক্কা থেকে গ্রেফতার করে মাল্টায় আটকে রাখা হয়।

'হিজবুল্লাহ' নামে এক বিপ্লবী সংগঠনের সদস্য হিসেবে কমপক্ষে ১,৭০০ স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রাণত্যাগের শপথ নিয়েছিলেন। মাওলানা আবুল কালাম সম্পাদিত ও প্রকাশিত 'আল-হিলাল' নামে একটি সংবাদপত্রকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিষিদ্ধ করে বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণা প্রচারের অভিযোগে। উপনিবেশ বিরোধী ধারণাকে জনপ্রিয় করে তোলার উদ্দেশ্যে মাওলানা আজাদ 'দারুল ইরশাদ' নামে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। হিজবুল্লাহ, জালালউদ্দীন ও আবদুর রাজ্জাক স্বাধীনতা যোদ্ধা নির্বাচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং বাংলায় হিন্দু ও মুসলিম বিপ্লবীদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেন। মাওলানা আজাদ ভারতের স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে অনেকবার কারাবরণ করেছেন এবং তিনি যখন ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট ছিলেন তখন ১৯৪২ সালে 'কুইট ইন্ডিয়া' বা 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব পাস করা হয়েছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে 'রেশমি রুমাল আন্দোলন' ব্রিটিশ বিরোধী একমাত্র প্রতিরোধ আন্দোলন ছিল না। 'গদর আন্দোলন' অনুরূপ আরেকটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, যে আন্দোলনে বহু মুসলিম অংশগ্রহণ করেন এবং ব্রিটিশের জুলুম নির্যাতনে ইন্তেকাল করেন। ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর দেশীয় সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহের ইন্ধন দেওয়ার অভিযোগে রহমত আলীকে লাহোরে ফাঁসিতে ঝোলানো হয়েছিল। এ আন্দোলন সিঙ্গাপুরে বেশ সাফল্য লাভ করেছিল, যখন ১৯১৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ফিফথ লাইট ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের সিপাহিরা বিদ্রোহ করে, যাদের অধিকাংশই ছিল পাঞ্জাবি মুসলিম। বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারী